ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা:
সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

সার-সংক্ষেপ

৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক-গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
তাসলিমা আক্তার, *প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*
মো. জুলকারনাইন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*

কৃতজ্ঞতা
বেসরকারি চিকিৎসাসেবার সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বিশেষজ্ঞ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মকর্তা যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মূল্যবান মতামত, পরামর্শ, ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহজাদা এম আকরামের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, আউটরিচ ও কমিউনিকেশন বিভাগের পরিচালক ড. রেজওয়ানুল আলম, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের পরিচালক আবদুল আহাদ, এবং অন্যান্য সহকর্মী যারা বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা ও মূল্যবান মতামত দিয়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

১. ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

টিআইবি'র জাতীয় খানা জরিপ (২০১৫) অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের একটি বড় অংশ (৬৩.৩% খানা) সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে। বাংলাদেশের চিকিৎসকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ (৬০.৩%) বেসরকারি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, হেলথ বুলেটিন ২০১৫)। গত চার দশকে নিবন্ধিত বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে - ১৯৮২ সালে ৩৩টি থেকে বর্তমানে এর সংখ্যা ১৫,৬৯৮টি (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২০১৭)। সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং নীতিতেও এ খাতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২১) বেসরকারি স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে একটি শক্তিশালী এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ কাঠামো, সরকারি বিধি-বিধান তৈরি, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর মান বিষয়ক তথ্য সেবাগ্রহীতাকে সরবরাহ নিশ্চিত করা, এবং শক্তিশালী ও দায়িত্বশীল পেশাজীবী সংগঠন গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে (২০১১) বেসরকারি সংস্থাগুলোকে স্বাস্থ্যসেবায় সম্পূরক ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা, মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান তৈরি ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ অন্যান্য ব্যয় সহনীয় মাত্রায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া যায়, যার মধ্যে উচ্চ চিকিৎসা ব্যয়, প্রত্যাশিত সেবার মানের ঘাটতি, সঠিক রোগ-নির্ণয় না হওয়া, কমিশন-নির্ভর সেবা, নিবন্ধন ছাড়া চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তবে বিভিন্ন গবেষণা ও আলোচনায় বেসরকারি চিকিৎসাসেবার মান নিয়ে বলা হলেও সার্বিকভাবে এ খাতের সুশাসন নিয়ে অনুসন্ধানী গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। টিআইবি'র কার্যক্রমে স্বাস্থ্য অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত একটি খাত এবং ইতোমধ্যে সরকারি চিকিৎসাসেবার মান নিয়ে টিআইবি'র স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এই ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ও আওতা

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা এবং এসকল চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের জন্য সুপারিশ প্রদান করা এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- বেসরকারি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করা;
- বেসরকারি চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন চিহ্নিত করা; এবং
- অনিয়ম ও দুর্নীতির পেছনে বিদ্যমান কারণ চিহ্নিত করা।

এ গবেষণায় বেসরকারি চিকিৎসাসেবা বলতে ব্যক্তি মালিকানাধীন নিবন্ধিত বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র প্রদত্ত সেবাকে বোঝানো হয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (প্রাসঙ্গিক আইন, বিধিমালা ও নীতি, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি প্রতিষ্ঠান ও তাদের সক্ষমতা), প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের জনবল, অবকাঠামো, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বিপণন কার্যক্রম), সেবা কার্যক্রম (চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীর সেবা, রোগ-নির্ণয়, জরুরি ও বিশেষায়িত সেবা, অস্ত্রোপচার, প্রসূতি সেবা, ওষুধ, সেবার মূল্য, চিকিৎসাসেবার পরিবেশ, তথ্য প্রকাশ) এবং নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম (নিবন্ধন ও নবায়ন, মালিকানা ও অংশীদারিত্ব, তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা, পরিদর্শন, অভিযোগ, জরিমানা ও শাস্তি)। উল্লেখ্য, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান ও এ খাতে কর্মরত সকল চিকিৎসক, নার্স, কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি ও সময়

এটি একটি গুণগত গবেষণা, এবং গুণবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান ও সেবাদাতা, সেবাগ্রহীতা, নিয়ন্ত্রণকারী ও তদারকি কর্তৃপক্ষ, অন্যান্য অংশীজনদের কাছ থেকে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (মোট তথ্যদাতা ৭০৬ জন), ফোকাস দল আলোচনা (মোট ২৭টিতে অংশগ্রহণকারী ৩১০ জন; ১৪টি পুরুষের ও ১৩টি নারীর অংশগ্রহণে) ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সারা দেশে নিবন্ধিত ১১৬টি (হাসপাতাল ৬৬টি এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র ৫০টি) বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি বিভাগীয় শহর, প্রত্যেক বিভাগের অধীন একটি করে আটটি জেলা

শহর ও বাছাইকৃত জেলার অধীন একটি করে আটটি উপজেলা শহর (মোট ২৪টি) থেকে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়, এবং জনসংখ্যা ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিবেচনায় ঢাকা মহানগরীর মধ্য থেকে ২৬টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয় এবং ঢাকার বাইরে অন্যান্য এলাকা থেকে ৯০টি প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। এসব প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে সেবাগ্রহীতাদের মতামত বিবেচনা করা হয়। পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা, সরকারি নথিপত্র, গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

২. গবেষণার উল্লেখযোগ্য ফলাফল

২.১ আইন ও নীতি পর্যালোচনা

বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য দি মেডিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০, মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯, চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭, পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ১৯৯৭, এবং জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০১১ বিদ্যমান।

তবে বেশ কিছু আইন ও বিধি থাকলেও কিছু সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রধান আইন 'দি মেডিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২' প্রণয়নের পর এখন পর্যন্ত হালনাগাদ করা হয় নি, এবং এই আইনের কোনো বিধিমালাও করা হয় নি। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা আইনের খসড়া তৈরির ক্ষেত্রে সকল অংশীজনের সমন্বয়ের ঘাটতি, আইন প্রণয়নে স্বার্থের দ্বন্দ্ব, এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় নিয়ে কাজ করা হলেও তা এখনো আইন হিসেবে প্রণয়ন করা হয় নি। কার্যত নির্বাহী আদেশের ভিত্তিতে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। এই আইনের নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতাগুলো চিহ্নিত করা যায়।

- **নিবন্ধন, অবকাঠামো ও জনবল:** সেবার ধরন অনুযায়ী চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানকে সংজ্ঞায়িত করা হয় নি এবং সে সংজ্ঞা অনুযায়ী সেবার আওতা নির্ধারণ করা হয় নি। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধনের ক্ষেত্রে কোন কোন কর্তৃপক্ষ থেকে ছাড়পত্র নিতে হবে এবং চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন কতদিন পর নবায়ন করতে হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় নি। প্রতিষ্ঠানভেদে সেবার ধরন অনুযায়ী ন্যূনতম মান (আবশ্যিক ইউনিট, এর অবকাঠামো, অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি, সংশ্লিষ্ট জনবলের দক্ষতা, শয্যা অনুযায়ী চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য জনবল) সম্পর্কে যেমন বলা হয় নি, রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের সেবাপ্রদানকারীর ন্যূনতম সংখ্যা, তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কেও বলা হয় নি। সেবাগ্রহীতাদের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ (ধারা ৯) সম্পর্কে বলা হলেও এর কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই।
- **সেবার মূল্য:** অধ্যাদেশে উল্লিখিত সেবার মূল্য তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও বর্তমান সময়ের জন্য এটি বাস্তবসম্মত নয়। অধ্যাদেশে সার্জিক্যাল অপারেশনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেবার মূল্য (অপারেশন চার্জ, ওষুধ, এনেসথেসিয়া চার্জসহ সাধারণ ডেলিভারি) এবং রেডিওলজি ও ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে বলা হলেও (ধারা ৩) তা হালনাগাদ করা হয় নি। এছাড়া কোনো কোনো সেবার মূল্য সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয় নি (যেমন, শয্যা, ভর্তি ফি ইত্যাদি)। চিকিৎসকের পরামর্শ ফি সম্পর্কে বলা হলেও আইনের সংশোধনী ১৯৮৪ (ধারা ৫) এর মাধ্যমে এটি বাতিল করা হয়েছে, কিন্তু পরবর্তীতে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন বা বিধি দ্বারা সুনির্দিষ্ট করা হয় নি। পরামর্শ ফি এবং চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আদায়কৃত বিভিন্ন সেবা মূল্য চেম্বার, ক্লিনিক এবং পরীক্ষাগারে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন (ধারা ৭) সম্পর্কে বলা হলেও পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে এক সংশোধনীর (সংশোধনীর ধারা ৪) মাধ্যমে ধারাটি পরিবর্তন করে আইনে নির্ধারিত মূল্যের পরিবর্তে ঐ প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসক কর্তৃক নির্ধারিত ফি প্রদর্শন করতে বলা হয়।
- **তথ্য সংরক্ষণ:** নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য (নিবন্ধন ও নবায়ন, পরিদর্শন, জনবল ইত্যাদি) সংরক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে কোনো দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয় নি। চিকিৎসক এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবাগ্রহীতার সেবা সম্পর্কিত তথ্য (রোগের ধরন, প্রদত্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ওষুধ, জন্ম ও মৃত্যু সংখ্যা, প্রসূতি সেবা ইত্যাদি) সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও কোনো দিক-নির্দেশনা দেওয়া হয় নি।
- **শাস্তি:** বিদ্যমান আইনে শাস্তির পরিমাণ বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে খুব কম। তাছাড়া সেবা প্রদানে চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনিয়মের প্রেক্ষিতে সেবাগ্রহীতা কোথায় অভিযোগ করবে সে সম্পর্কে বলা হয় নি।

এছাড়া প্রায়ই চিকিৎসক কর্তৃক অবহেলা ও ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেলেও এ ধরনের ঘটনার প্রেক্ষিতে অভিযোগ করার কোনো বিধান নেই। অন্যদিকে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রায়শই সেবা সম্পর্কিত বিষয় (সেবাগ্রহীতার মৃত্যু ও অন্যান্য) নিয়ে চিকিৎসক, হাসপাতালের কর্মরত ব্যক্তি ও সেবাগ্রহীতার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বাক বিতণ্ডা, মারামারি এবং হাসপাতাল

ভাংচুরের মতো ঘটনা ঘটলেও সেবা প্রদানকারীর নিরাপত্তা এবং প্রতিষ্ঠান সুরক্ষায় সুনির্দিষ্ট আইন নেই। সরকারের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন পরিকল্পনায় বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান বা খাত নিয়ে কোনো বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয় নি।

২.২ বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

২.২.১ প্রতিষ্ঠানের মালিক ও অংশীদার

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা ও অংশীদারদের মধ্যে রয়েছেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী (পুলিশ, সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্স), বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসক, চিকিৎসকের স্ত্রী, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, মেডিকেল প্রতিনিধি, প্রবাসী, ব্যবসায়ী, কর্পোরেট গ্রুপ, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, পল্লী চিকিৎসক, শিক্ষক, ওষুধ বিক্রেতা, গৃহিণী ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানে অংশীদারদের সংখ্যা সর্বনিম্ন দুইজন থেকে সর্বোচ্চ ২২৬ জন পর্যন্ত। একদিকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে অংশীদার হিসেবে সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিক ও সাংবাদিক, এবং অন্যদিকে সেবাগ্রহীতা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্স, পল্লী চিকিৎসক, মেডিকেল প্রতিনিধিদের মালিক বা অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

২.২.২ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও নবায়ন

আইন অনুযায়ী লাইসেন্স ছাড়া বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক বা রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র পরিচালনা করা অনুমোদিত না হলেও গবেষণায় দেখা যায় সাধারণত বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের অনুমোদন না নিয়েই চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম শুরু করে। এছাড়াও সারা দেশে কতগুলো অনিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে তার হিসাব কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা (১৯৯৭) অনুযায়ী হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরিকে পরিবেশের ছাড়পত্র নিতে হলেও নির্বাচিত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯৭টি পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেয় নি বলে দেখা যায়। এছাড়া পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী তালিকাভুক্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান (হাসপাতাল এবং ক্লিনিক ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাবসহ) আবাসিক এলাকায় স্থাপিত হওয়ায় নিষেধাজ্ঞা থাকলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪২টি প্রতিষ্ঠান আবাসিক এলাকায় অবস্থিত। ২২টি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা যায় একই ভবনে আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিবন্ধনের সময় জেনারেল মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি ও অবস সেবা প্রদানের জন্য অনুমোদন নিলেও পরবর্তীতে অনুমোদন না নিয়েই বিশেষায়িত সেবা (আইসিইউ, সিসিইউ, এনআইসিইউ, কার্ডিয়াক প্রভৃতি) প্রদান করছে বলে দেখা যায় (নির্বাচিত ৬৬টি হাসপাতালের মধ্যে বিশেষায়িত সেবা প্রদান করছে ২০টি প্রতিষ্ঠান)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমোদন ছাড়া অতিরিক্ত শয্যা ব্যবহার করা হয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৩৬টি প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত শয্যার সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে এবং তন্মধ্যে ২৩টি প্রতিষ্ঠান এর জন্য অনুমোদন গ্রহণ করে নি।

নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে, যা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান, মালিক/অংশীদারদের ওপর মহলে যোগাযোগ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে।

আইন অনুযায়ী নিবন্ধিত সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি বছর লাইসেন্স নবায়ন করা বাধ্যতামূলক হলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টি প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে লাইসেন্স নবায়ন করায় নি। কিছু ক্ষেত্রে নবায়নের শর্ত শতভাগ পূরণ না করা সত্ত্বেও নবায়ন দেওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিদর্শনের তারিখ প্রতিষ্ঠানগুলোকে পূর্ব থেকে অবহিত করা হয় এবং এক্ষেত্রে পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনবল ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র ঠিক রাখে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নবায়নের সকল শর্ত পালনে ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে একদিকে নবায়ন পাচ্ছে, এবং অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন না করেই অর্থের বিনিময়ে নবায়ন দেওয়া হচ্ছে, যার পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

২.২.৩ প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো

অধিকাংশ ক্লিনিক এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র চিকিৎসাসেবার জন্য উপযোগী করে তৈরি ভবনে অবস্থিত হওয়ায় চিকিৎসাসেবার জন্য যথাযথ নয় (গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২২টি)। ভর্তিরত প্রতি সেবাগ্রহীতার জন্য বরাদ্দকৃত মেঝের আয়তন কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুবই কম। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে একটি কেবিনকে হার্ডবোর্ড দিয়ে দুটি কক্ষ করা, আবার কোনো ক্ষেত্রে একটি ছোট্ট কক্ষের মধ্যে তিন থেকে চারটি শয্যা রাখা হয়েছে। একটি আইসিইউ কক্ষে শয্যা রাখার কারণে চলাফেরার জন্য স্থানের পরিমাপ খুবই কম দেখা যায়।

উপজেলা পর্যায়ে এবং কোনো কোনো জেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে জরুরি সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেই (গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৬টি হাসপাতাল/ক্লিনিকের মধ্যে ২১টিতে)। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৬৬টি প্রতিষ্ঠানে অপারেশনের ব্যবস্থা থাকলেও এর মধ্যে নয়টি প্রতিষ্ঠানে পোস্ট-অপারেটিভ কক্ষ নেই, আবার কিছু ক্ষেত্রে পোস্ট অপারেটিভ কক্ষ সেবাগ্রহীতাদের জন্য ব্যবহার করা হয় না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ৫০টি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের মধ্যে ১২টিতে পৃথক নমুনা সংগ্রহ কক্ষ নেই, এবং প্যাথলজিস্টদের জন্য পৃথক কক্ষ নেই ২৬টি প্রতিষ্ঠানে।

তিনতলার বেশি অবকাঠামোর ক্ষেত্রে লিফট সুবিধার কথা বলা হলেও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত তিনতলার বেশি উঁচু ৬৪ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২১টি প্রতিষ্ঠানের লিফটের ব্যবস্থা নেই। কিছু প্রতিষ্ঠানের সিঁড়ি এবং লিফট স্ট্রেচার/ ট্রলি ব্যবহারের জন্য যথাযথ নয়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৭৭টি প্রতিষ্ঠানে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক টয়লেট ব্যবস্থা নেই। জরুরি এবং সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১২টি প্রতিষ্ঠানে জেনারেটরের ব্যবস্থা আছে, তবে চারটি প্রতিষ্ঠানে জেনারেটর থাকলেও প্রতিষ্ঠান পর্যবেক্ষণের সময় তা সক্রিয় দেখা যায় নি। এছাড়া জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কিছু প্রতিষ্ঠানে সেবাগ্রহীতাকে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নেওয়ার জন্য ট্রলি/ স্ট্রেচার/ হুইল চেয়ার ছিল না। প্যাথলজিতে যন্ত্রপাতি ও রি-এজেন্ট সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য সর্বদা এসি চালু থাকার প্রয়োজন থাকলেও কিছু ক্ষেত্রে এসি নেই আবার কিছু ক্ষেত্রে থাকলেও তা সর্বদা ব্যবহার করা হচ্ছে না। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের পার্কিং ব্যবস্থা অপ্রতুল।

চিত্র: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো

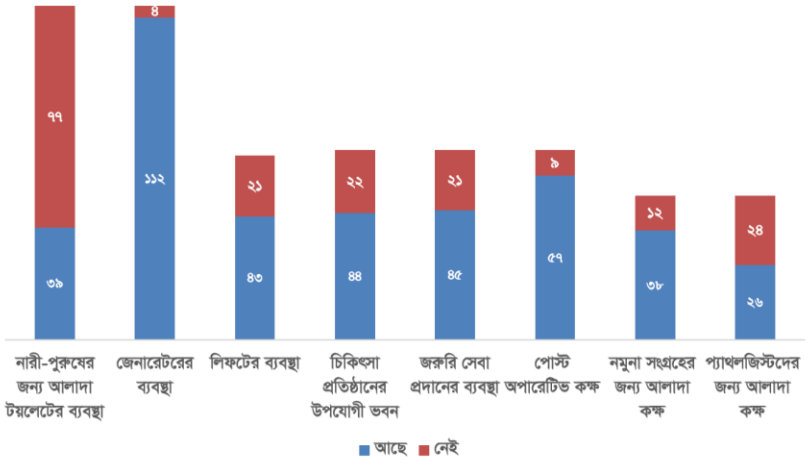

২.২.৪ প্রতিষ্ঠানের জনবল

সার্বক্ষণিক চিকিৎসক: আইন অনুযায়ী বেসরকারি হাসপাতাল/ ক্লিনিকে প্রতি ১০ শয্যার জন্য তিন শিফটে তিনজন চিকিৎসক রাখার কথা থাকলেও তা মেনে চলা হয় না। বিশ্লেষণে দেখা যায়, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতাল/ ক্লিনিকগুলোতে উপজেলা শহরের ক্ষেত্রে গড়ে ১.১, জেলা শহরে ১.৩, বিভাগীয় শহরে (ঢাকা ব্যতীত) ২.৩ এবং ঢাকা মহানগরে ৩.২ জন চিকিৎসক রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের (৬৬টি) মধ্যে ৫২টি প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক চিকিৎসক নেই। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব চিকিৎসক নেই, অন-কল ভিত্তিক সেবা প্রদান করা হয়।

সারণি ১: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের জনবল

এলাকা	সার্বক্ষণিক চিকিৎসক নেই	সার্বক্ষণিক নার্স নেই	সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্নতা কর্মী নেই	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতাল ক্লিনিকের সংখ্যা
উপজেলা শহর	১৩	১৪	৭	১৪
জেলা শহর	১৩	১৬	৮	১৬
বিভাগীয় শহর	১১	৯	৬	১৪
ঢাকা মহানগর	১৫	১৪	৮	২২
মোট	**৫২**	**৫৩**	**২৯**	**৬৬**

সার্বক্ষণিক নার্স: আইন অনুযায়ী বেসরকারি হাসপাতাল/ ক্লিনিকে প্রতি ১০ শয্যার জন্য ছয়জন ডিপ্লোমা নার্স রাখার কথা থাকলেও তা মেনে চলা হয় না। বিশ্লেষণে দেখা যায়, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হাসপাতাল/ ক্লিনিকগুলোতে উপজেলা শহরের ক্ষেত্রে গড়ে ১.১, জেলা শহরে ১.৫, বিভাগীয় শহরে (ঢাকা ব্যতীত) ৬.২ এবং ঢাকা মহানগরে ৬.৪ জন নার্স রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের (৬৬টি) মধ্যে ৫৩টি

প্রতিষ্ঠানেই সার্বক্ষণিক ডিপ্লোমা নার্স নেই। ডিপ্লোমা ডিগ্রি নেই কিন্তু কয়েক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ব্যক্তিদের দিয়ে নার্সের কাজ করানো হয়। সার্বিকভাবে সারা দেশে শয্যা অনুযায়ী বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকের জন্য ৪৭,০৫৬ জন নার্স প্রয়োজন হলেও ঘাটতি ২০,২৮১ জনের। বিশেষায়িত সেবা প্রদানেও নার্সের স্বল্পতা (বর্তমানে বিশেষায়িত সেবা প্রদানে প্রশিক্ষিত মাত্র ২১০ জন) রয়েছে।

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট ও অন্যান্য: উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের বেশিরভাগ রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে সনদবিহীন টেকনোলজিস্ট দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থিত রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলোতে নিজস্ব প্যাথলজিস্ট, রেডিওলজিস্ট এবং সনোলজিস্ট রাখা হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কল দিয়ে নিয়ে আসা হয়। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে অবেদনবিদেরও (এনেসথেসিওলজিস্ট) ঘাটতি রয়েছে।

২.২.৫ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের কিছু প্রতিষ্ঠানে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি, যেমন জরুরি বিভাগে অক্সিজেন, সাকার মেশিন, নেবুলাইজার, স্টেরিলাইজার, অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ ইত্যাদি রাখা হয় নি বলে দেখা যায়। এছাড়া অপারেশন থিয়েটারে ডায়াথারমি, এনেসথেসিয়া, সক্রিয় ওটি লাইট, স্পট লাইট ইত্যাদি দেখা যায় নি, এবং পোস্ট অপারেটিভ কক্ষে কার্ডিয়াক মনিটর, অক্সিজেন/ভেন্টিলেশন সাপোর্ট ইত্যাদি ছিল না।

ওষুধের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান প্যাথলজি ফ্রিজ ব্যবহার না করে সাধারণ ফ্রিজ ব্যবহার করে, আবার সাধারণ ফ্রিজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিষ্ঠান পৃথক থার্মোমিটার ব্যবহার করে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অনেক প্রতিষ্ঠানে নিডল ডেস্ট্রয়ার ব্যবহার করা হয় না, বা নিডল ডেস্ট্রয়ার থাকলেও ব্যবহৃত সুঁই সাথে সাথে বিনষ্ট করা হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সুঁই ও সিরিঞ্জ বাইরে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

২.২.৬ চিকিৎসা-বর্জ্যের ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে চিকিৎসা বর্জ্য পৃথকীকরণ ও অপসারণ নিয়মটি সঠিকভাবে মানা হয় না। চিকিৎসাসেবা স্থলে বর্জ্যের ধরন অনুসারে সুনির্দিষ্ট রঙের বর্জ্যপাত্র ব্যবহারের কথা বলা থাকলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয় না। দেখা যায় ন্যূনতম চার রঙের বর্জ্যপাত্র (কালো, লাল, হলুদ এবং নীল) ব্যবহার করছে ১৮টি প্রতিষ্ঠান এবং তিন রঙের বর্জ্যপাত্র (কালো, লাল এবং হলুদ) ব্যবহার করছে ৩০টি প্রতিষ্ঠান। কিছু প্রতিষ্ঠানে পৃথক রঙের বর্জ্যপাত্র রাখা হলেও সকল ইউনিটের ক্ষেত্রে তা মানা হয় নি এবং কিছু ক্ষেত্রে সকল ধরনের বর্জ্য একই ধরনের পাত্রে রাখা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠান চিকিৎসা বর্জ্য যত্রতত্র ফেলে রাখে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা বর্জ্য অপসারণ যথাযথভাবে করে না। এছাড়াও চিকিৎসা-বর্জ্যের যথাপথ ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মচারীদের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।

হাসপাতালকে সংক্রমণমুক্ত করার জন্য অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে ফিউমিগেশন করা হয় না। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপারেশন কার্যক্রমে ব্যবহৃত যন্ত্র সংক্রমণমুক্ত করার জন্য অটোক্লেভ যন্ত্র ব্যবহার করা হলেও তথ্য সংগ্রহের সময়ে তিনটি প্রতিষ্ঠানের অটোক্লেভ যন্ত্র অকার্যকর ছিল। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোতে অটোক্লেভ পরিচালনার ক্ষেত্রে কর্মচারীদের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।

২.২.৭ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ

প্রতিষ্ঠানগুলো নিবন্ধন নেওয়ার সময়ে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করলেও পরবর্তীতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি মেনে চলা হয় না। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩২টি প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের ঘাটতি লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ার্ড ও কেবিনের মেঝে পরিষ্কার না রাখা, আইসিইউ কক্ষের মেঝে স্যাঁতস্যাঁতে, অপরিচ্ছন্ন চাদর, যত্রতত্র ময়লা ফেলে রাখা, দুর্গন্ধ বের হওয়া, কেবিনের কক্ষগুলো আবদ্ধ ও জানালার ব্যবস্থা না থাকা, আলো বাতাসের অপর্যাপ্ততা, এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের যন্ত্রপাতির ওপর ধুলাবালি ইত্যাদি উল্লেখ করা যায়। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৪১টি প্রতিষ্ঠানের টয়লেট পরিচ্ছন্ন ছিল না।

২.৩ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসাসেবা

২.৩.১ চিকিৎসক প্রদত্ত সেবা

চিকিৎসাসেবা গ্রহণকালীন সময়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সার্বক্ষণিক চিকিৎসক সেবা পায় নি বলে জানায়, বিশেষকরে জরুরি প্রয়োজনে রাতের বেলায় চিকিৎসক সেবা পাওয়া যায় নি। উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সপ্তাহে এক বা দুইদিন উক্ত এলাকার বাইরে থেকে এসে পরামর্শ প্রদান করে থাকে বলে অস্ত্রোপচার-পরবর্তী জটিলতা বা ফলো-আপের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে পাওয়া যায় নি।

২.৩.২ নার্স/ আয়া/ ওয়ার্ড বয় প্রদত্ত সেবা

সেবাগ্রহীতার জরুরি প্রয়োজনে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নার্সকে ডেকে পাওয়া যায় নি, বরং সেবাগ্রহীতাদের সাথে দুর্ব্যবহার বা বিরক্তি প্রকাশ করে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের আয়া দিয়ে নার্সের কাজ করানো হয়। সেবাগ্রহীতার প্রয়োজনে আয়াকে ডাকা হলেও দুর্ব্যবহার করে বা বিরক্তি প্রকাশ করে থাকে।

২.৩.৩ প্রসূতি সেবা

কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রসবের দিনের অনেক পূর্বে সি-সেকশন করানো এবং কিছু ক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক সি-সেকশনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং সিজারের সংখ্যা কম হলে চিকিৎসককে বেতন দেরিতে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মালিকের পক্ষ থেকে বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য চিকিৎসক কর্তৃক প্রসূতিকে সি-সেকশন করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে সিজারিয়ান প্রসবের হার ২০০৪ সালে ছিল ৪%, যা বেড়ে ২০১৪ সালে ২৩% হয়েছে (বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে ২০১৪), যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে এটি হওয়া উচিত ১০-১৫ শতাংশ। বাংলাদেশে বেসরকারি হাসপাতাল/ ক্লিনিকে সি-সেকশনের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের হার ৮০% (স্টপ আননেসেসারি সি-সেকশন ২০১৬)।

২.৩.৪ বিশেষায়িত সেবা

বিশেষায়িত সেবা প্রদানে প্রতিষ্ঠানগুলোতে শয্যা অনুসারে কী ধরনের ব্যবস্থা থাকবে সে সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় একেক প্রতিষ্ঠান একেকভাবে সেবা প্রদান করছে। রোগী মারা যাওয়ার পরও আইসিইউতে রাখা অথবা আইসিইউ সেবার প্রয়োজন না হলেও আইসিইউতে রাখার অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালিক কর্তৃক আইসিইউ থেকে প্রতি মাসে সুনির্দিষ্ট মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের অভিযোগ রয়েছে।

২.৩.৫ রোগ-নির্ণয়

চিকিৎসক কর্তৃক সেবাগ্রহীতাকে অতিরিক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নমানের রি-এজেন্ট ও মেয়াদউত্তীর্ণ রি-এজেন্ট ব্যবহারের অভিযোগ রয়েছে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে সাদা প্যাডে পূর্ব থেকে বিশেষজ্ঞের স্বাক্ষর করে রাখা ও টেকনিশিয়ান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উক্ত প্যাডে প্রতিবেদন তৈরি করা, কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে টেকনিশিয়ান চিকিৎসকের নামে স্বাক্ষর করা, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরীক্ষা না করেই (বালতি টেস্ট) প্রতিবেদন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানগুলোর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সঠিক হয় না বলে অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতারা দীর্ঘদিন চিকিৎসাসেবা নেওয়ার পরও ভালো না হওয়ায় পুনরায় অন্য কোনো শহরাঞ্চল বা দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা করিয়ে দেখে পূর্বের প্রতিবেদন সঠিক ছিল না।

২.৩.৬ সেবার মূল্য

এলাকাভেদে (উপজেলা, জেলা এবং বিভাগীয়) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবার মূল্যের ব্যাপক তারতম্য বিদ্যমান। রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্যের ব্যাপক তারতম্য লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, সরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানে এসব সেবার মূল্যের ব্যাপক পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

সারণি ২: গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন সেবার মূল্যের তারতম্য ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনা

পরীক্ষার নাম	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্য (টাকা)	সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবার মূল্য (টাকা)
লিপিড প্রোফাইল	৭০০ - ১,৬৫০	৩০০
প্লাটিলেট কাউন্ট	৭০ - ৫০০	৫০
সিরাম ক্রিয়েটিনিন	২১০ - ৫৮০	৫০
সিরাম ক্যালসিয়াম	২১০ - ৭০০	৮০
আলট্রাসনোগ্রাম (হোল এবডোমেন)	৫৫০ - ৮০০ (সাধারণ) ৮০০ - ২,২০০ (ডিজিটাল কালার)	২১০ (সাধারণ)

অন্যদিকে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাভেদে চিকিৎসকের পরামর্শ ফি সর্বনিম্ন ২০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ২,০০০ টাকা পর্যন্ত দেখা যায়। পুরাতন রোগীর পরামর্শ ফি'র ক্ষেত্রে ভিন্নতা এবং পরীক্ষার প্রতিবেদন দেখানোর জন্য কিছু ক্ষেত্রে ফি নেওয়া হয়। চুক্তিভিত্তিক সিজারিয়ানের ক্ষেত্রে শয্যা ভেদে সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ প্রায় ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়।

২.৩.৭ ওষুধ

যে কোনো ধরনের অপারেশনের জন্য সেবাগ্রহীতাকে কখনো কখনো বাইরে থেকে ওষুধ কিনে দিতে হয়, আবার কখনো কখনো প্যাকেজ চুক্তি করা হয়, যার মধ্যে ওষুধ অন্তর্ভুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার জন্য কী পরিমাণ ওষুধ ব্যবহার করা হলো তার হিসাব সেবাগ্রহীতা বা তার অ্যাটেনডেন্টকে দেওয়া হয় না এবং চুক্তির মধ্যে সকল ওষুধ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা দেওয়া হয় না, বরং পরবর্তীতে আরও ওষুধ কিনে দিতে হয়। অভিযোগ রয়েছে, সেবাগ্রহীতাদের দিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ওষুধ কেনানো হয় এবং তা থেকে কিছু ওষুধ পরবর্তীতে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

২.৪ বেসরকারি চিকিৎসাসেবার বিপণন ব্যবস্থা

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই কমিশনভিত্তিক বিপণন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন পর্যায়ে কমিশনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন সরকারি ও বেসরকারি চিকিৎসক, স্বাস্থ্য সহকারি, পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, পল্লী চিকিৎসক, ফার্মেসীর ওষুধ বিক্রেতা, ধাত্রী, বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের রিসিপশনিস্ট, রিক্সাওয়ালা ও পেশাদার দালাল। এই কমিশনের পরিমাণ সর্বনিম্ন ২৫% থেকে সর্বোচ্চ ৫০% পর্যন্ত হয়ে থাকে। সি-সেকশনের জন্য পাঠালেও কমিশন দেওয়া হয়, যার পরিমাণ সর্বনিম্ন ৫০০ থেকে ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত। সেবাগ্রহীতারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেশাদার দালাল কর্তৃক হয়রানি হয় বলে অভিযোগ রয়েছে, যেমন ভুল তথ্য দিয়ে বা জোর করে অন্য প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া। এ ধরনের ঘটনা বিশেষ করে গ্রাম থেকে শহরে আসা অসচেতন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে।

২.৫ তথ্যের উন্মুক্ততা

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮৫টি প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স দৃশ্যমান স্থানে টানানো নেই, এবং ২৮টিতে আংশিকভাবে চিকিৎসকের পরামর্শ ফি সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শিত রয়েছে। আবার, কিছু প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় ভিজিটের ক্ষেত্রে পরামর্শ ফি এবং সময়সীমা সম্পর্কে তথ্য দেওয়া থাকলেও প্রতিষ্ঠানের সকল চিকিৎসকের ক্ষেত্রে দেওয়া নেই। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান পরামর্শ ফি'র রশিদ সেবাগ্রহীতাকে দেয় না বলে জানা যায়। চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক কর্তব্যরত চিকিৎসক সম্পর্কিত তথ্য প্রদর্শন বা সংরক্ষণ করা হয় না, কোনো ক্ষেত্রে কর্তব্যরত কনসালটেন্টদের (অন-কল ভিত্তিক ও স্থায়ী) তথ্যও প্রদর্শিত নেই।

অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করা থাকলেও সকল সেবার মূল্য টানানো নেই। আবার কিছু ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শয্যার ভাড়া সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করা হয়েছে। নির্বাচিত ৫০টি রোগ নির্ণয় কেন্দ্রের মধ্যে ২১টিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল্য সম্পর্কে তথ্য প্রদর্শন করা নেই। কিছু প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী বর্জ্য পাত্র ব্যবহার সম্পর্কে তথ্য টানানো থাকলেও অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা মানা হয় নি। নির্বাচিত ১১৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৯০টি প্রতিষ্ঠানে রংভেদে কোন পাত্রে কী ধরনের বর্জ্য ফেলতে হবে এ ধরনের নির্দেশিকা প্রদর্শন করা নেই।

এছাড়া নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া নিবন্ধিত/ অনিবন্ধিত চিকিৎসক সম্পর্কে জানতে বিস্তারিত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। বিএমডিসি'র রেজিস্টারে অভিযোগের ধরন এবং এর হালানাগাদের ব্যবস্থা নেই; বিএমডিসি'র ওয়েবসাইটে এ সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা নেই।

২.৬ তদারকি

২.৬.১ চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের তদারকি

বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান নিয়ন্ত্রণে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের তদারকি কার্যক্রম পর্যাপ্ত নয়। দেখা যায়, নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইসেন্স প্রদান ও নবায়নের জন্য পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকলেও উক্ত সময় ছাড়া অন্য সময়ে কোনো ধরনের পরিদর্শন করে না। তাছাড়া সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর লাইসেন্স নবায়ন করে না বিধায় এসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের আওতার বাইরে থেকে যায়, এবং তাদের সেবা কার্যক্রম যাচাইয়ের সুযোগ হয় না। পরিদর্শনে অনিয়ম পাওয়া গেলেও পরবর্তীতে তা ফলো-আপ করা হয় না।

মোবাইল কোর্ট বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাঝে মাঝে পরিদর্শন এবং নিয়মের ব্যত্যয়ে জরিমানা বা শাস্তি দিলেও তা খুবই সীমিত। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত ২৫টি প্রতিষ্ঠানকে মোবাইল কোর্ট জরিমানা করেছে বলে জানা যায়।

২.৬.২ চিকিৎসকদের তদারকি

অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের অতিরিক্ত ডিগ্রি এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভুয়া পদবির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ভুয়া চিকিৎসকদের শাস্তি প্রদান করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। সরকারি দায়িত্বকালীন সময়ে কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসক কর্তৃক বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেবা প্রদানের অভিযোগ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ সুনির্দিষ্ট বেসরকরি প্রতিষ্ঠানে সেবা প্রদান না করলেও তাদের নাম ব্যবহার করা হয় বলে দেখা যায়।

সারণি ৩: একনজরে বেসরকারি চিকিৎসাসেবায় সুশাসনের ঘাটতির কারণ-ফলাফল-প্রভাব

কারণ	ফলাফল	প্রভাব
▪ আইনি সীমাবদ্ধতা (সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে আইন ও বিধির অনুপস্থিতি ও হালনাগাদ আইন না থাকা) ▪ আইন/নীতির প্রয়োগে ঘাটতি ▪ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতার (অবকাঠামো, জনবল, যন্ত্রপাতি) ঘাটতি ▪ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকিতে ঘাটতি ▪ স্বচ্ছতার ঘাটতি ▪ জবাবদিহিতায় ঘাটতি ▪ স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও রাজনৈতিক প্রভাব	▪ নিবন্ধন ও নবায়নে অনিয়ম ▪ কমিশনভিত্তিক সেবা ব্যবস্থা ▪ সঠিক ও মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত না হওয়া ▪ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাত সঠিকভাবে না হওয়া ▪ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ না থাকা ▪ নিয়মিত তদারকি না হওয়া ▪ সেবার অতিরিক্ত মূল্য	▪ চিকিৎসাসেবার নামে অতি মুনাফাভিত্তিক বাণিজ্যের প্রসার ▪ প্রতারণানির্ভর চিকিৎসাসেবার প্রসার ▪ সেবাগ্রহীতাদের আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতি এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি বৃদ্ধি ▪ চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি জনগণের অনাস্থা তৈরি ▪ বিদেশে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি ▪ রোগ সংক্রমণের ঝুঁকি বৃদ্ধি

৩. সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা খাতে বাণিজ্যিকীকরণের প্রবণতা প্রকট। এখানে অতি মুনাফা-কেন্দ্রিক সেবা কার্যক্রম, কমিশনভিত্তিক সেবা ব্যবস্থা, এবং গুণগত মানের চেয়ে সংখ্যাগত বিস্তৃতি লক্ষ করা যায়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত হওয়া সত্ত্বেও এখানে সরকারের যথাযথ মনোযোগের ঘাটতি রয়েছে, যার ফলে বিভিন্ন পরিকল্পনায় এ খাতকে গুরুত্ব না দেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট আইন হালনাগাদ না করা লক্ষণীয়। এছাড়া আইন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়া, স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি কারণে দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় বেসরকারি চিকিৎসাসেবা আইনের খসড়া নিয়ে কাজ করা হলেও তা এখনো আইন হিসেবে প্রণয়ন হয় নি। নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর উন্নয়ন না করা, পরিদর্শন ও তদারকিতে ঘাটতি, এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতিও বিদ্যমান। এর ফলে একদিকে এটি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ছে, এবং অন্যদিকে কিছু ব্যক্তির এ খাত থেকে বিধি-বহির্ভূত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষকরে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানগুলোতে সক্ষমতার ঘাটতি ও অনিয়মের প্রবণতা লক্ষণীয়। সার্বিকভাবে এই ব্যবস্থার কাছে সাধারণ সেবাগ্রহীতারা জিম্মি হওয়ার কারণে একদিকে ব্যাপকভাবে আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতির শিকার হচ্ছে এবং অন্যদিকে মানসম্পন্ন চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে না।

৪. সুপারিশ

গবেষণার ফলাফল থেকে বেসরকারি চিকিৎসাসেবা খাতের সুশাসন বাড়ানোর জন্য নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হচ্ছে।

আইন ও নীতি সম্পর্কিত

১. চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণে একটি স্বাধীন কমিশন তৈরি করতে হবে।

২. বেসরকারি চিকিৎসাসেবা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য খসড়া আইনটি চূড়ান্ত করে আইন হিসেবে প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে:
   - নার্সিং হোম, ক্লিনিক, জেনারেল হাসপাতাল, বিশেষায়িত হাসপাতাল ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রগুলোর সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং প্রতিষ্ঠানের সেবার ধরন ও শয্যা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিকরণ করতে হবে। এই শ্রেণি অনুযায়ী প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে, যেমন অবকাঠামো, জনবল, যন্ত্রপাতি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি;
   - প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি অনুযায়ী নিবন্ধন ও নবায়ন ফি নির্ধারণ;
   - প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকল ছাড়পত্রের বাধ্যবাধকতা;
   - প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি/ উৎপাদন খরচ/ চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাভেদে বিভিন্ন সেবার মূল্য নির্ধারণ;
   - প্রয়োজনীয় তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের বাধ্যবাধকতা;
   - শাস্তির পরিমাণ সময়োপযোগী এবং বাস্তবসম্মতভাবে বৃদ্ধি।

৩. বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোকে (তথ্য প্রাপ্তি ও প্রকাশের ক্ষেত্রে) তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের জন্য

৪. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে (কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে)।

৫. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন নির্ধারণ করে দিতে হবে।
৬. অন-লাইনের মাধ্যমে লাইসেন্স আবেদন ও নবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।
৭. চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠান ও তাদের সেবা সম্পর্কিত সকল ধরনের হালনাগাদ তথ্য (চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন নম্বর, নবায়নকাল, সার্বক্ষণিক সেবা প্রদানকারী জনবল ও তাদের নিবন্ধন নম্বর, অবকাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদি) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং এসব তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত থাকতে হবে।
৮. চিকিৎসা-বর্জ্যের যথাযথ ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটিকে সক্রিয় এবং সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা/ ইউনিয়নকে যথাযথ প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।
৯. বিএমডিসির ওয়েবসাইটে সব চিকিৎসকের নিবন্ধন নম্বর এবং শিক্ষার ধরন অনুযায়ী অনুসন্ধানের বিদ্যমান ব্যবস্থার পাশাপাশি চিকিৎসকের নাম দিয়ে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা থাকতে হবে, এবং চিকিৎসক সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য থাকতে হবে।
১০. বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারীদের অভিযোগ দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বিএমডিসি) পরিচালনায় আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে।
১১. চিকিৎসকদের অনৈতিক প্রচারণা ও কার্যক্রম চিহ্নিত ও রোধ করার জন্য সারা দেশে বিএমডিসি'র তদারকির আওতা বাড়াতে হবে।
১২. অনিবন্ধিত সকল চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে, এবং এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৩. বেসরকারি চিকিৎসাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর মান নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সমিতিকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

সেবা সম্পর্কিত

১৪. সকল প্রতিষ্ঠানে নারীবান্ধব সেবা প্রদানে পুরুষ ও নারীর জন্য পৃথক এবং ব্যবহার উপযোগী টয়লেট ব্যবস্থা, ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার, নারী সেবাপ্রদানকারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে
১৫. কর্মরত সকল সেবা প্রদানকারীর জন্য নির্ধারিত পোশাক পরিধানের ব্যবস্থা বা আইডি কার্ড ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে
১৬. সেবা প্রদানকারীদের (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত নিবন্ধন নম্বর ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে হবে (যেমন, নার্সদের ইউনিফর্মে/ আইডি কার্ডে, চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র ও ভিজিটিং কার্ডে)।